International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-I, July 2017, Page No. 35-43
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

নারী : পিতৃতন্ত্র ও লিঙ্গবৈষম্যের প্রেক্ষিতে

টোটন হাজরা
আংশিক সময়ের অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In modern society 'Woman' is one of the most discussed topics. Even today 'she' lives at the lowest level of social recognition depending on the basis of gender discrimination. In this modern times too, woman is neglected and tortured. In this following essay/paragraph I am trying to survey, in brief, the socio-economic condition of woman in society from Riqvedic period to modern times. The seed of gender division is deep rooted. One can see the instance (this as a topic) on various books of different times. In our petrachan society all the scriptures show that a woman is a child producing machine. She is totally depended on the male figures of the family (father, husband, son). She has no willing of her own. Each and every act of a female is either dominated or instructed by the male member. Not only that a woman is considered as a pleasure giver of sex without heart. Here also she has to act according to the will of her husband. The traditional Hindu religion tries its best to deprive a woman from her legal rights of property. The reason is totally economical. It is not a rare incident that a new born girl kid is killed only because at the time of her marriage her father has to bear a lot of expense as dowry. Actually the religious superstitions and man's indomitable greed for money-these two constitute dowry so fatal that in this 19th Century too, a girl is killed just only for dowry. Now by killing a female foetus, the birth of daughter or the number of daughters are being tried to control better to say check. The most vivid example of gender discrimination and its impact on woman is the burning of a chaste wife on the funeral pile of her husband. Even today it is very tough for a woman to establish her own identity in the society by doing a job or working. Only because she is thought to be a lower creature. So, the time has come when women have to protest against every fortune and inequality of the society she faces for the sake of woman's progress. And we need a revolutionary spirit in every woman which can cause a great cultural revolution. This revolution will destroy the religious differences, the caste distinction, communalism, polygamy, unwilling marriage, child marriage, dowry and all other fatal/vicious superstitions at a time.

Key Words: Woman, Dowry, Superstitions, Foetus, Child Marriage, Unequality, Revolution.

সাম্প্রতিক সময়ে যাকে নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে, যে উঠে আসে সংবাদপত্রের শিরোনামে ও টেলিভিশনের পর্দায়, সেই 'নারী' এক বহু চর্চিত বিষয়। মানুষের স্বীকৃতি পেতে তাকে প্রাচীন যুগ থেকে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করতে হয়েছে, হারিয়ে যেতে হয়েছে মাতৃজঠরে অবাঞ্ছিত ভ্রূণ হিসেবে কিংবা যাকে জন্ম মুহূর্তে আশ্রয় নিতে হয়েছে আঁতুড় ঘড়ের মাটির নীচে অথবা আবর্জনায় অথবা পাতকুয়োয়। কিন্তু 'নারীবাদ' নিছক মহিলাদের স্বার্থে একটা তত্ত্ব নয়, 'নারীবাদ' একটি জীবনবীক্ষা যা আজকের পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক বিষয়।

নারীকেন্দ্রিক আলোচনায় যে কথাটি বারবার উচ্চারিত হয়, তা হল 'পুরুষতান্ত্রিক' অর্থাৎ 'পিতৃতান্ত্রিক' সমাজব্যবস্থা। এই 'পিতৃতন্ত্র' বলতে বোঝায় 'পুরুষের আধিপত্যবাদ', যা প্রতি মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় নারীকে। বিশিষ্ট নারীতাত্ত্বিক Silvia তার "Theorising Patriarchy" (1990) গ্রন্থে বলেছেন— 'পিতৃতন্ত্র' হচ্ছে সামাজিক কাঠামো আর রীতিনীতির এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে, নীপিড়িত করে এবং শোষণ করে'।[১] বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক গের্ডা লানার "The Creation of Patriarchy" (1986) গ্রন্থে বলেছেন, পিতৃতন্ত্রের অধীনে নারীর তুলনায় পুরুষকে স্বাভাবিকভাবে উৎকৃষ্ট ভাবার জৈব নিয়ন্ত্রণবাদী সিদ্ধান্ত সেই প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একইভাবে চলে আসছে'।[২] এই 'পিতৃতন্ত্রে'র উদ্ভব সম্পর্কে এঙ্গেলস এর বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এঙ্গেলস মনে করতেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্ভবের জন্যেই নারীর বশ্যতার সূত্রপাত হয়। তিনি তাঁর "The Origin of the Family, Private Property and State" (1884) গ্রন্থে বলেছেন-- 'মাতৃস্বত্ত্ব যেদিন পরাভূত হয় সেদিনই পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর পরাজয় ঘটে। গৃহের কর্তৃত্বও পুরুষের হাতে চলে যায়, নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নারীর দাসত্বের সূচনা'।[৩]

পিতৃতন্ত্রের এক মোক্ষম প্রতীক হল সিঁদুর। কৌম আদিম সমাজে পুরুষ যখনই কোনো নারীর দখল নিত, ঐ নারী যে তারই সম্পত্তি একথা জানানোর জন্য শকুনের ডানার পালক দিয়ে সিঁথি চিরে মেয়েটিকে রক্তচিহ্নিত করে রাখত। উপজাতি সমাজেও নখ দিয়ে বা অস্ত্র দিয়েও সিঁথি চেরা হতো। এটা সম্পূর্ণভাবেই মালিকানা চিহ্ন, যেভাবে গবাদি পশুর গলায় পুঁতি ও ঘণ্টা বেঁধে চিহ্ন রাখা হয়। কালক্রমে এই প্রথা সংস্কৃতি হয়ে হিন্দুর সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়েছে। সিঁদুরের সঙ্গে সহযোগী লোহা, শাঁখা সবই শৃঙ্খলের প্রতীক। এই প্রতীকগুলি হিন্দুর কাছে ধর্মগ্রন্থের মতো গুরুত্ব পায়, কারণ এগুলি যে শুধুই প্রতীক, জীবনের সঙ্গে, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই, একথা আমরা ভুলে গেছি। যদিও হিন্দু ছাড়া পৃথিবীর অনান্য মানব প্রজাতি সিঁদুর ছাড়াই সুখে শান্তিতে ঘর করে। ঐতিহ্যপরায়ণ জাপানিরা, গোঁয়াড় অশিক্ষিত রাজস্থানীরা, আফ্রিকার কালো মানুষেরা সিঁদুর ছাড়াই দীর্ঘ দাম্পত্য চালিয়ে যাচ্ছে। তবুও আমরা আঁতকে উঠি কোনো হিন্দু বিবাহিত নারীর সিঁথিতে সিঁদুর না দেখলে।

ভারতবর্ষের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীই আদি-শক্তির উৎস। সর্ব দেশে সর্ব কালে নারী-প্রগতির সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, যে দেশে বা সমাজে নারী অবহেলিতা, নিপীড়িতা এবং লাঞ্ছিতা ইতিহাসের খরস্রোতের অনিবার্য গতিতে অভীষ্টের দিকে ধাবমান না হয়ে সে পঙ্কিল আবর্তে গতিহীন জলাশয়ে পরিণত হয়। এদেশের শীর্ণকায়, খর্বকায় বীরপুরুষদের কর্তৃক রচিত ধর্মীয় অনুশাসনে নারীসমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শোষিত, নির্যাতিত এবং শৃঙ্খলিত শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় নারীর শৃঙ্খলমোচন ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত ভারতের মুক্তি ও প্রগতি কখনোই সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষের নারী মুক্তির প্রতিবন্ধকতা এতটাই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জোরালো যে একটি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই অন্য আরও কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা আষ্ঠেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে। আগেই বলা হয়েছে, জন্ম-দিনে দাঁড়িয়েও নারী জন্ম থেকেই পিতৃগৃহে অবাঞ্ছিতা, বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনই আজও এদেশে নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য রূপে প্রতিফলিত। কিন্তু এর বাইরে নারীর কোনো স্বাধীন স্বত্ত্বা, কর্মসাধনা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রয়োজন

আছে - সেটা খুব অল্পসংখ্যক মাতা-পিতাই মনে করেন। সুতরাং কালের ইতিহাসে পিতৃ কুলপঞ্জিকায় দেনার খাতাতেই শিশুকন্যার হিসেব লেখা থাকে। এটাই জন্মসময়ে অসংখ্য নারীশিশুকে হত্যা করার মূল কারণ। যদিও এক্ষেত্রে সিমোন দ্য বোভিয়ার বক্তব্য প্রাসঙ্গিক, তিনি মনে করেন - নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে, অর্থাৎ জৈবিকভাবে একজন শিশু স্ত্রীলিঙ্গ নিয়ে জন্মায় এটুকুই প্রাকৃতিক সত্য। জন্মলগ্নে সে জানে না যে তার পরিচিতি নারী, না পুরুষ রূপে!

প্রশ্ন ওঠে আমাদের সমাজব্যবস্থায় নারীর সংজ্ঞা কী? বৈদিক যুগে যেমন—'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এ 'নারী' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর কথার ওপরে কথা বলে না'।[৪] আবার বশীষ্ঠ ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে 'পিতা রক্ষিত কৌমারে, ভর্তা রক্ষিত যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবরি পুত্রাণ স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'।[৫] অর্থাৎ নারীকে কৌমার্যে রক্ষা করবেন পিতা, যৌবনে স্বামী আর বার্ধক্যে পুত্র, নারী প্রতি অবস্থায় পুরুষের অধীন, তার কোনো নিজস্ব সত্ত্বা নেই।

এখানেই শেষ নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও যখন প্রশ্ন করা হয় নারী কে?

> "ধর্ম বলে : নারী থেকেই পাপের জন্ম, ধর্মাচরণে সে পুরুষের সহকারিণী মাত্র।
> আইন বলে : মা তার সন্তানের অভিভাবক নয়, ধাত্রী মাত্র, সন্তান পিতার।
> শিল্প বলে : নারী সুন্দরী, যৌন উত্তেজনা সঞ্চারিণী, প্রেরণাদাত্রী, শিল্পসৃষ্টি তার কাজ নয়।
> বিজ্ঞাপন বলে : নারী মা, নারী গৃহিনী, নারী এক অতিসুন্দরী অলীক মানবী।
> সাহিত্য বলে : নারী প্রেরণা ঊর্বশী অর্থাৎ যৌনতার প্রতীক, নারী গৃহ লক্ষ্মী, যে নারী সাহিত্য সৃষ্টি করে সে পুরুষের জগতে অনুপ্রবেশকারী 'মহিলা কবি'।
> দর্শন বলে : মাতৃত্ব আর স্বামীসেবাই নারীর আসল দায়িত্ব, যা তাকে মহীয়সী করে।
> সমাজ বলে : নারী শ্রীমতী, অমুক-পুরুষ বা মিসেস তমুক-পুরুষ, তার নিজস্ব কোন পরিচিতি নেই। নারী অনাম্নী অনুগত, অন্তঃপুরচারিণী।
> অর্থনীতি বলে : সাবধান, এখানে নয়, কাজের জগৎটা পুরুষের। পুরুষ ভর্তা, নারীর ভরণপোষণের দায় তার। নারী নির্ভরশীল"।[৬]

বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা ও নানা কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে ভারতীয় নারীর অবস্থা দুর্বিষহ। নারী মুক্তির প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলির অন্যতম লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণা। প্রাচীন কাল থেকে তথাকথিত বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং জাতিভেদ প্রথার অবিচ্ছেদ্য এবং প্রধান আঙ্গিক হিসেবেই এদেশে অস্পৃশ্যতার কলুষ গড়ে উঠেছে, যা পক্ষান্তরে লিঙ্গবৈষম্যের ধারক ও বাহক; যার চরম পরিণতি লক্ষ্য করা যায় নারীর জীবনে। জাতিভেদ প্রথার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে সমাজে নারীদেরকে কখনও মানুষের মতো মাথা তুলে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি। ধর্মের মধ্য দিয়েই এই বৈষম্যের উৎস আর আইনের মধ্য দিয়েই তা প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। কোন শব্দ বা বাক্যকে তখনই লিঙ্গবিদ্বেষ বলা হয় যখন তা স্ত্রী ও পুংলিঙ্গের মধ্যে অন্যায়ভাবে অপ্রয়োজনীয় পার্থক্য গড়ে তোলে এবং তা থেকে কোন এক লিঙ্গের ওপর পীড়ন ও শোষণের ভিত্তি তৈরি হয়। লিঙ্গ বৈষম্যবাদী ভাষা আসলে এমন এক প্রতিকী কৌশল যা একটি লিঙ্গের কার্যকলাপ গণ্ডীবদ্ধ করে, অথচ অন্য লিঙ্গের ক্ষেত্রে সেই সব কাজের জন্য কোন বাধানিষেধই আরোপ করা হয় না। সারা পৃথিবীতে পিতৃতন্ত্রের মতো এককাট্টা, নিশ্চিদ্র আর কোন বৈষম্যের ব্যবস্থা বোধ হয় গড়ে ওঠেনি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় 'নারীত্ব' মানে গৃহকর্মা, লজ্জাশীলতা, প্রশ্নহীন আনুগত্য, নয়নসুখকর চেহারা, সেবাপরায়ণতা, সতীত্ব ও নির্ভরতা অর্থাৎ এককথায় গৃহবন্দিত্ব ও যৌনবন্দিত্ব; কিন্তু পুরুষের ধারণা এর ঠিক বিপরীত বহিঃমুখী বেপরোয়া, উপার্জনশীল, আস্থাযোগ্য ইত্যাদি সংজ্ঞায়, বিশেষণে বিভূষিত।

নারীবিদ্বেষ থেকে শুরু করে লেখকের অসচেতন শ্রেষ্টত্ববোধ পর্যন্ত বিভিন্নমাত্রায় লিঙ্গবৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা যদি বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে উদাহরণগুলি দেখি তাহলে সেখানে দেখা যায় যে কিভাবে তার মধ্য দিয়ে লিঙ্গবৈষম্যের বীজ বপণ করা হয়েছে। 'মানব', 'মানুষ' ইত্যাদি শব্দগুলি লিঙ্গনিরপেক্ষ একথা আমাদের শেখানো হয়। সত্যিই কি তাই? বিখ্যাত যুক্তি বাক্য ইংরেজি গ্রামারে ব্যবহৃত হয়; অলমেন আর মরটাল/সক্রেটিস ইজ এম্যান, পাঠ্যপুস্তক নির্মাতারা পারবেন কি সক্রেটিসের বদলে লক্ষীবাঈ বা ভার্জিনিয়া উলফের নাম বসাতে? না পারলে স্বীকার করতে হয়, 'মানবতাবাদ' এক লিঙ্গবৈষম্যবাদী শব্দ, স্বীকার করতে হয়, 'সবার উপর মানুষ সত্য'- এই বাক্যবদ্ধ যতোই মহান শোনাক তা থেকে বাদ পড়েছে মানুষীর দল, মানুষের তৈরি শিল্পতত্ত্ব, সাহিত্য, সমাজ, নাটক, সিনেমা, পাঠ্যপুস্তকে যতদিন মানুষীরা বহিরাগত বা দ্বিতীয় লিঙ্গের ভূমিকায় থেকে যাবে ততদূরে সরে যাবে লিঙ্গসাম্য অর্জনের লক্ষ্য।

১৯৬৫ সালে ভারতের এডুকেশন কমিশনে ঘোষিত হয়েছিল যে, উভয়লিঙ্গের পরস্পরের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা গড়ে ওঠা প্রয়োজন, কারণ লিঙ্গের ভিত্তিতে বিষয় বা কর্মসূচী ভাগ করে একদলকে 'পুরুষালি' ও অন্যদলকে 'মেয়েলি' বলে গণ্য করা অবৈজ্ঞানিক। আমাদের এই তত্ত্ব ব্যাপকভাবে প্রচার করা উচিত যে দুই লিঙ্গের মধ্যে তথাকথিত মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য আসলে লিঙ্গভিত্তিক নয় বরং সামাজিকভাবে নির্মিত এক 'পুরুষালি' ও 'মেয়েলি' ব্যক্তিত্বের স্টিরিওটাইপ ধারণা ভাল করার চেয়ে ক্ষতি বেশি করে। আমরা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছি পাঠ্যসূচির মাধ্যমে এই চেতনার বিকাশ ঘটাতে যে নারী ও পুরুষের মধ্যে সেবায় ও কর্মদক্ষতায়, তত্ত্বে ও প্রয়োগে, ঘরে ও বাইরে, সৃষ্টি ও নির্মাণে কোন প্রকৃতিগত অবশ্যম্ভাবী পার্থক্য নেই। বরং নারীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে পদানত করে, গৃহবন্দী করে, দাসত্ব স্বীকার করিয়ে তার ঘাড়ে পা রেখে নিজের কীর্তিসৌধ বানিয়েছে পিতৃতন্ত্রী পুরুষ, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে পুংলিঙ্গ চালায়, আর অনুসরণকারী স্ত্রীলিঙ্গ চলে, পুংলিঙ্গ উপার্জন করে যায় শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞাপনে, ধর্মে, আইনে, গণমাধ্যমে, ছড়ায়, রূপকথায় এবং পাঠ্যপুস্তকে। এঙ্গেলস বলেছিলেন, শ্রেণি শোষণের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল পুংলিঙ্গ দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গের শোষণ। আর ভার্জিনিয়া উলফ প্রথম ঘোষণা করেন যে, লিঙ্গ পরিচয় জন্মগত নয়, সামাজিকভাবে নির্মিত এক অভ্যাস, যাকে চ্যালেঞ্জ জানানো যায়, যার পরিবর্তনও সম্ভব।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শাস্ত্রমতে পুত্রের জন্ম দেওয়ার জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন হয়। কারণ পুত্রহীন পুরুষের স্থান হয় নরকে। কিছু ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, "পুত্র পুৎনামক নরক থেকে পিতাকে উদ্ধার করে বলেই তাকে পুত্র বলে"।[৭] তাই স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য হল, পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে স্বামীকে নরক থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা। মনুর বিধান অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মানোর সাথে সাথেই পুরুষ পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয় এবং অনন্তত্ত্ব লাভ করে। পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক থেকে পরিত্রাণ করে এবং প্রপৌত্র সূর্যলোকে বাসের কারণ হয়। আসলে পিতৃতন্ত্রকে অমর করে রাখার জন্যই পুত্রের মাধ্যমে মরণশীল মানুষের স্বর্গবাস ও অমরত্বের কথা বলেছেন শাস্ত্রকারগণ। কিন্তু যে গর্ভধারিণী স্ত্রী স্বামীর অমরত্বের কারণ হয়, তার নিজের অমরত্ব প্রাপ্তির কথা শাস্ত্রসাহিত্যেও অনুচ্চারিত। ধর্মশাস্ত্রের যুগ থেকে শূদ্রের মত নারীকেও শিক্ষা ও ঋণসঞ্চয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং নিঃস্ব করে সারাজীবনের তাদের স্বতন্ত্র লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে দেওয়া হয়নি। বাইবেল ও কোরাণ, পুরাণ ও রামায়ণ, যে ধর্ম প্রচার করেছে তার নাম পৌরুষধর্ম। কোন ধর্মগ্রন্থে মেয়েদের পুরুষের সমমর্যাদা দেওয়া হয়নি। বরং সর্বত্র সর্বতোভাবে মেয়েদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে। বাইবেলে তারাই ভালো নারী যারা অনুগত, বিশ্বাসী, গৃহরক্ষা ও সন্তানপালনে ইচ্ছুক হিসাবে চিহ্নিত; তার পুরুষেরা যোদ্ধা, বিচারক, গণক, শাসক ইত্যাদি। ভাষার মধ্য দিয়ে লিঙ্গ পক্ষপাত বাইবেল বেশ সুবিন্যস্ত চেহারা নেয় 'ম্যান' শব্দটি প্রয়োজনে 'পুরুষ', আবার প্রয়োজনে লিঙ্গনিরপেক্ষ সার্বজনীন অর্থেও ব্যবহৃত। কিন্তু 'ওম্যান' সবসময়ে ওম্যান, 'মানুষ' শব্দের মধ্যে মানুষীকে অদৃশ্য অস্তিত্ব করে রাখার পেছনে এই ধারণা দায়ী যে, নারীর কোন নিজস্ব অস্তিত্ব নেই, সে পুরুষের ছায়াসঙ্গিনী। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' বলা হয়েছে; "পুত্র হল সর্বোচ্চ স্বর্গের প্রদীপ, আর কন্যা দুঃখের কারণ"।[৮] বৈদিক বিবাহমন্ত্র- 'ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দবৈতু, মম চিত্তাননূ চিত্তং

তেহস্ত'।[৯] (আমার সেবায় তোমার হৃদয় দান কর, তোমার চিত্ত আমার চিত্তকে অনুসরণ করুণ)। মহাভারতে ভীষ্মের অনুশাসন অনুযায়ী-শূদ্রের মত নারীরও ধনসঞ্চয় করার কোন অধিকার ছিল না। ভার্যা এবং দাস কোন ধন উপার্জন করলেও সে ধনে তাদের নিজস্ব কোন অধিকার জন্মাতো না। ভার্যা ও দাসের অর্জিত ধনে অধিকার থাকতো শুধু তাদের প্রভুর অর্থাৎ গৃহস্বামীর।

লিঙ্গশোষণের ধারণা অনুসারে মেয়েরা পুরুষদের দ্বারা ব্যবহৃত, নিয়ন্ত্রিত, পদানত ও শোষিত হয়। এই শোষণ কৌশল সমাজের গভীরতর স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের বিন্যাস হয় ক্ষমতার সম্পর্কের ভিত্তিতে। পুরুষ নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ব বজায় রাখার সবরকম কৌশল নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে, পিতৃতন্ত্রের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে রাষ্ট্র, ধর্ম, অর্থনীতি, পরিবার, লিঙ্গাশ্রয়ী পার্থক্য, অসাম্য ও শোষণ তারই ফসল। মেয়েদের সব চেয়ে বড় পরাজয় ঘটেছিল পরিবার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই। পরিবার স্থাপন মানেই স্ত্রীলিঙ্গের সতীত্বের ধারণা আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার একযোগী উত্থান, যৌথপরিবারের নারীরা হয়ে ওঠে সর্বসাধারণের দাসী। ভারতীয় পরিবারে সবচেয়ে বড় অভিশাপ বউ পেটানো। বউ খুন, কন্যাভ্রূণ হত্যা, কন্যার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের আচরণ অর্থাৎ এক কথায় চরম লিঙ্গবৈষম্য বাস্তবের এই প্রক্রিয়া প্রতিমুহূর্তে সমর্থিত হয়, লিঙ্গবৈষম্যবাদী সিনেমা, টিভি সিরিয়াল, মেয়েদের পত্রিকা, সংবাদপত্র, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, আইন, রাজনীতি, পাঠ্যপুস্তক, তত্ত্ব, দর্শন ও বিজ্ঞাপনে।

নারীকে একটি যৌনযন্ত্র মাত্র মনে করার বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গিই তার আজীবন পরাধীনতার তত্ত্বের অন্যতম উৎস। প্রাচীন যুগে পরিবার ছিল বহুপত্নীক অর্থাৎ যৌন একনিষ্ঠতার দায় শুধু মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি মেয়েদেরই দেওয়া হতো, পুরুষদের ক্ষেত্রে তা প্রয়োজ্য ছিল না। স্ত্রীলোকের সতীত্বের বিষয়ে শাস্ত্রে বলা হয়েছে— "যদি কাহাকেও অপরের স্ত্রীর সঙ্গে নদীর সঙ্গমস্থলে কী স্নানের ঘাটে, কী উদ্যানে অথবা অরণ্যে বাক্যালাপ করতে দেখা যায় বা তার সঙ্গে বিহার করতে দেখা যায় বা তাকে চুম্বন করতে দেখা যায় বা তার প্রতি চক্ষুদ্বারা ইঙ্গিত করতে বা হাস্য করতে দেখা যায় বা তার বস্ত্র বা আবরণ অনুচিত স্থানে স্পর্শ করতে দেখা যায় বা তার হস্ত, কেশ অথবা বস্ত্রপ্রান্ত ধরতে দেখা যায়",[১০] তাহলে তাকে ব্যাভিচার বলা হবে।

নারীর এই যৌনবন্দিত্ব একদিনে ঘটেনি, মুক্ত মাতৃতান্ত্রিক জীবনের স্বাধীনতা মুছে পুরুষের হাতে বন্দী হতে মেয়েদের বহু সময় লেগেছিল, পুরুষকে তৈরি করতে হয়েছিল শ্রেষ্ঠতার তত্ত্ব ও হিংস্রতার অস্ত্র। 'নিকট প্রাচ্যের প্রাক ইতিহাসচর্চা থেকে এমন বহু ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মেয়েদের পদানত করতে পাঁচ হাজার বছর বা তারও বেশি সময় লেগেছিল। ১২০০০ থেকে ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রাক-সভ্যতার মেয়েরা পূর্ণ স্বাধীন যৌনতায় অভ্যস্ত ছিল এবং প্রায়শই যৌনিচ্ছা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হতো। এ থেকে মনে যেতে পারে কৃষির প্রাথমিক সূত্রপাতের (১২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পর থেকে নাগরিক জীবন ও নথিভুক্ত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটতে যে দীর্ঘ সময় লেগেছিল তার অন্যতম কারণ নারীদের (৮০০০-৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) নিয়ন্ত্রন সম্ভাবনাহীন চক্রাকার যৌন সম্পর্কের অভ্যেস। যতদিন পর্যন্ত না এই যৌনঅভ্যেস কঠোর সামাজিক নিয়ম প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রনে আনা হয় ততদিন পরিবার জীবন ঘাতসহ ও সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠেনি, যেখান থেকে আধুনিক সভ্য মানুষের স্থিতিশীল উদ্ভব হয়। নারীর যৌনতাকে পদানত করার পেছনে ছিল সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অনিবার্য অর্থনীতি, যা পুরুষ প্রয়োগ করতে এবং নারী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল, যদিও তা ধর্ম, কুসংস্কার ও যুক্তির মোড়কে প্রচারিত হয়েছিল'।[১১]

নারী জাতিকে শুধুমাত্র এক হৃদয়হীন যৌনযন্ত্র রূপে গন্য করবার পেছনে অবশ্য যৌনজ্ঞানের অভাব ছাড়ও আরেকটি গভীরতর কারণ আছে, এবং তা হল অর্থনৈতিক। এদেশে প্রাচীন কাল থেকেই কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্র-সন্তানের সমাদর বেশি, কারণ শ্রমিক হিসাবে এবং আজীবন নির্ভরতার দিক থেকে পুত্রসন্তানের মূল্য অনেক বেশি,

যদিও এই আর্থিক কারণকে ধামাচাপা দেবার জন্য ধর্মব্যবসায়ী শাস্ত্রকারেরা এই তত্ত্ব প্রচার করেছেন যে, পুন্নামক নরক থেকে ত্রাণ করে বলেই পুত্রের একান্ত প্রয়োজন। বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনই যেহেতু নারী জীবনের উদ্দেশ্য, পিত্রালয়ে অনূঢ়া তরুনী হিসাবে তাই তার কোনো আর্থিক মূল্য নেই। বরঞ্চ পরিবারের উপর সে এক বিরাট আর্থিক বোঝাস্বরূপ। বিবাহিত নারী হিসাবে সে একাধারে স্বামীর শয্যাসঙ্গীনী এবং সমস্ত পরিবারের অবৈতনিক দাসী। জন্মগত লিঙ্গবৈষম্য বিলুপ্ত না হলে নারীর জৈবিক, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ সুদূর পরাহত।

বিবাহ ও সন্তান উৎপাদন এদেশে নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে গণ্য হলেও বিবাহ প্রথাকে মানবতাধর্মী এবং সুন্দর করে গড়ে তুলবার উল্লেখযোগ্য কোনও চেষ্টা আজ হয়নি। বরং বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে বিবাহ এ সমাজে এক অশোভন, বর্বর ও বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে সমস্ত কুৎসিত প্রথা প্রচলিত আছে, তারমধ্যে বাল্যবিবাহ একটি সামান্য কুপ্রথা নয়। বিশেষ রূপে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এটাই হল বিভিন্ন অনিষ্টের মূল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে একটি পত্রিকায় "কন্যাদান" সম্পর্কে লেখা হয়েছিল "কন্যা জন্মনিলেই সর্বনাশ। বরের অথবা বরের পিতামাতার অসঙ্গত অর্থলোভই এই বিপত্তির কারণ.... পরিণয় সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে বরের পিতামাতার কন্যার পিতামাতার নিকট অসঙ্গত অর্থ প্রার্থণা করেন। কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ দিগের প্রতিজ্ঞাপূর্বক অর্থগ্রহণ চিরপ্রসিদ্ধ আছে। এই কুৎসিত প্রথা যে পূর্বে ছিল না তাহা শাস্ত্রকারদিগের বচন দ্বারাই স্বপ্রমাণ হইতেছে।"[১২] প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং মানুষের অর্থস্পৃহা, এ দুটি মিলেই বরপণ প্রথাকে এতটাই ভয়াবহ করে তুলেছিল যে আঠারো এবং উনিশ শতকে শিশুকন্যা হত্যার অন্যতম কারণ ছিল বরপণ। বর্তমানে তো কন্যাভ্রুণকে হত্যা করে কন্যার জন্মকেই প্রতিরোধ করা হচ্ছে। শৈশবে কন্যাকে পাত্রস্থ করলে তার ভরণপোষণের ব্যয় এবং যৌতুকের পরিমাণ দুই-ই কম হয় বলে বাল্যবিবাহ ও বালিকাবধূ নিষ্ঠুর নির্যাতন আজও এদেশের প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে চলেছে, আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও সামাজিক চেতনা এবং আন্দোলনের অভাব বশত বাল্যবিবাহ আজও বহুল প্রচলিত। আবার পণপ্রথার কলুষ এদেশে লক্ষ লক্ষ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সর্বস্বান্ত করে চলেছে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা তাদের একমাত্র সম্বল সামান্য জমিজমা কিংবা, হাঁড়ি-কলসি বিক্রি করে অথবা মহাজনের কাছে বন্ধক রেখে একেবারে নি:স্ব হয়ে পড়েন এবং সারা জীবন এই দেউলিয়া অবস্থা থেকে আর কখনও নিস্কৃতি পান না। নববধূর ভবিষ্যৎ জীবনেও অনেকাংশে যৌতুকের পরিমাণ দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কারণ যে বধূ যতবেশি যৌতুক নিয়ে শ্বশুরালয়ে আগমন করেন, সেখানে তার ততই বেশি সমাদর হয়। এক পরিবারের একাধিক গৃহবধূ থাকলে তাদের তুলনামূলক মর্যদা স্থির হয় বিবাহের সময় প্রদত্ত যৌতুক এবং পিত্রালয়ের আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে।

নারীর প্রতি লিঙ্গবিদ্বেষ মূলক আচরণের ক্ষেত্রে একালের সবচেয়ে কুৎসিৎ ও ঘৃণিত আচরণ হল সতীদাহ প্রথার প্রচলন। যে সময় সমাজে নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার অধিকারের জন্য লড়াই চলছে, ঠিক সেই সময় নারীদের বেঁচে থাকার অধিকার সর্বাগ্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সেই সময়ের সবচেয়ে বিধ্বংস এবং বিষাক্ত নারী নির্যাতনের যে চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তা হল সতীদাহ প্রথা অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী সেচ্ছায় 'সহমরণ'- যেটা এদেশের ইতিহাসে ধর্মের নামে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর্থ-সামাজিক কারণে নারী নির্যাতনেরই এক জ্বলন্ত উদাহরণ। এই সতীদাহ প্রথার প্রচলন ব্যাপারে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা যে যুক্তি দেন তা হল পতীর চিতায় নিজেকে আহুতি দিলে সতীর স্বর্গলাভ ঘটবে। কিন্তু এর পেছনে ছিল একটি কুৎসিৎ সুপ্ত বাসনা, সেটি হল স্বামীর মৃত্যুর পর তার ঘনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় তার স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায় তাহলে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় তার পৌরুষসিক্ত উত্তরাধিকারীরা। এই ঈপ্সিত বাসনা পূরণের জন্যই এই জগন্য সতীদাহ প্রথার প্রচলন করা হয়। কিন্তু আমরা কি এমন কোনো প্রথার কথা ভাবতে পারি যেখানে স্ত্রী জ্বলন্ত চিতায় স্বামীর সহমরণ। এই বিষটির যেন অচিন্ত্যনীয় এবং অকল্পনীয়। যদিও খুব সহজেই সেই সময় সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ 'সহমরণ'- নামক কুপ্রথাটি সচেতনভাবে এবং উৎসুক নয়নেই উপভোগে মগ্নপ্রভ থাকতেন সমাজ তাত্ত্বিক বিধান কর্তারা।

অবিবাহিতা নারীদের জীবনও বিশেষ বিড়ম্বনাময়; প্রাচীনকাল থেকে এদেশে বিবাহোৎসবে সন্তান উৎপাদনই নারী জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য হবার ফলে অবিবাহিতা নারীর জীবন ধর্মের মুখোশ পরা কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কোনওদিন বিন্দুবিসর্গও কল্পনা করতে পারেনি। নিজ কর্মসাধনায় রত বয়:প্রাপ্ত অবিবাহিতা নারীর পক্ষে সমাজে মর্যদার স্থান গ্রহণ করা আজও দুঃসাধ্য; নিজের অধিকার বাসা ভাড়া করা কিংবা নিকট আত্মীয়ের আশ্রয় ছাড়া অন্য কোথাও থাকা অথবা সামাজিক পরিবেশে সমাদর লাভ করা অবিবাহিতা নারীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আজও কোনও নারীর পক্ষে অবিবাহিত জীবন যাপন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অবিবাহিত পুরুষকে এদেশে সাধু-সন্ন্যাসী গণ্য করা হয়, কিন্তু অবিবাহিতা নারীকে অধঃপতিত জ্ঞান করাই এক সামাজিক রীতি। আবার একমাত্র স্বামীর পরিচিতা, স্বামীর প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিতা এবং স্বামীর "গর্বএ গর্বিণী' হবে নারীর ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূল্য শুধুই শূন্য। তিনি এক ব্যক্তিত্বহীন জীব বিশেষ এবং নারী প্রগতি তথা মনুষ্যজাতির প্রগতির অন্তরায় স্বরূপ। কোনও বিজ্ঞানসম্মত সমাজব্যবস্থা এহেন নারীর স্বীকৃতি করেনা কেউই।

নারীর কর্মসাধনা প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে, এদেশের প্রায় সব কৃষক-শ্রমিক পরিবারেই, অর্থাৎ শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ পরিবারেই মহিলারা খেত-খামারে, মাঠে-ঘাটে, কল-কারখানায় কাজ করেন এবং এদিক থেকে তাঁরা একটা বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণে সমর্থ। কিন্তু তাদের কঠোর শ্রম প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন কর্মসাধনার পর্যায়ে পড়ে না, কারণ এর সঙ্গে শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত মানসিক প্রবণতা বা যোগ্যতার কোনও সম্পর্ক নেই। এই শ্রম অনেকাংশেই, বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে, স্বামীর পরিবারের সামগ্রিক দাসী বৃত্তিরই নামান্তর মাত্র। তাই নারীর বিকাশের পথও রুদ্ধ; তিনি কোনও পুরুষের সঙ্গেই যুক্ত থাকুন না কেন। অপরপক্ষে যে নারী স্বীয় কর্ম সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেছে, তিনি কোনও পুরুষ নামক জীবের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও স্বগৌরবে মহীয়সী। সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন নারী জীবনের একমহান আদর্শ এ থিয়োরি নারীকে বশীভুত রাখবার উদ্দেশ্যে এদেশের গৃহকর্ম বিমুখ ও কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন পুরুষদের একটা হাতিয়ার মাত্র। নারী শুধু পুরুষের ছায়া নয়। স্বীয় ব্যক্তিসম্পন্ন শক্তিময়ী স্বাধীন কারা, স্বতঃসিদ্ধ এই সত্য স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত নারী জাগরণ সম্ভব নয়।

বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নয়, একটা জৈবিক প্রয়োজন মাত্র। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ সমগ্র প্রাণীজগতই একাজ করে থাকে। মানুষের মনুষ্যত্বতার কর্মসাধনায় ও মানসিক বিকাশে, এটা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানসত্য। নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও কর্মসাধনার আদর্শ গৃহীত হলে স্বভাবতই বিবাহও আর পিতামাতা এবং আত্মীয় সমাকুল উপজাতির একটা কেনাবেচার ব্যাপার থাকবে না।

বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় অকপটে ঘোষণা করে যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা জীবের মোক্ষ প্রাপ্তি পথের প্রধান অন্তরায়। তাদের মতে এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা দূর হলে জীব জ্ঞানের আলোকে প্রবেশ করে মোক্ষের স্বাদ পাবে। ঠিক অনুরূপভাবে নারী জাগরণের পথে অনিবার্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হবে স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। যার ফলে একদিকে ভারতের ঘরে ঘরে নারী জাতির চোখের সামনে বৃহত্তর পৃথিবীর দরজা খুলে যাবে, আর অন্যদিকে স্বাধীন কর্মসাধনার জন্য প্রস্তুত হবে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি। কিন্তু শিক্ষা এবং চৈতন্যের মধ্যে কোনও অবশ্যম্ভাবী কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। এর প্রয়োজন ব্যবহারিক জীবনে মননশীলতা। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তিগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

নারী প্রগতির আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নারীকে বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে হবে। কারণ সমাজের তথা বিশ্বমানবের স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যাক্তিজীবনের স্বাধীনতা একই সূত্রে গ্রথিত। পরিবেশে ধর্মান্ধতা, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, খাদ্যাখাদ্য, স্পর্শ, পূজাপার্বণ প্রভৃতি সংক্রান্ত এদেশের হাজার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। মনের এক কোণে বিভিন্ন কুসংস্কারকে যত্নে

লালন করে আরেক কোণে স্বাধীনতার নীড় বাধা অসম্ভব। কালো এমনই জিনিস যে সব আলো শোষণ করেও সে নিজের রঙ বজায় রাখে। অতএব কালোকে বর্জন না করলে আলোর রূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

আধুনিক মানবিক সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলতে পারি, সব মেয়ে রোজগার করুক এবং নারী ও পুরুষ ভাগ করে নিক গৃহকাজ। যখন পুরুষের কাজের জগতে জোরকদমে পা ফেলতে লাগবে মেয়েরা এবং মেয়েদের গৃহকাজের জগতে , সমানতালে হাত লাগাবে পুরুষ, যখন মাতৃত্ব হবে নারীর স্বেচ্ছাধীন ও সন্তানের ওপর নারীর অধিকার স্বীকৃত হবে, যখন নিছক যৌনপুতুলের চিত্রকল্প কেটে বেরিয়ে আসবে নারীর প্রকৃত মুখ। তখন একমাত্র তখনই এই মাটি ও সমাজ হয়ে উঠবে মেয়েদের স্বভূমি। বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন শক্তিময়ী নারীরা এদেশের দুরন্ত যৌবন গড়ে তুলবে এক উত্তাল সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সে বিপ্লব একই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে ধর্মভেদ, জাতিভেদ সাম্প্রদায়িকতা, বহুবিবাহ, পরাধীন বিবাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা এবং অন্ধকার জগতের আরও যতসব দুর্মর কুসংস্কার। কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন জালিমদের তৈরি সহস্র বাধানিষেধের লৌহ কারাগার চূর্ণ করে ভারতের নারী যেদিন সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করবেন, শক্তির কম্পন সেদিনই আরম্ভ হবে এদেশের আকাশে-বাতাসে, শক্তির স্পন্দনে সেদিন শিহরণ জাগবে এ মুমূর্ষ জাতির অস্থিমজ্জায়। তার গতিবেগে চঞ্চল হবে বিশ্ব। নারী অগ্রগতির স্রোতে ধরবে অক্সিজেনের হাওয়া।

'নারী স্বাধীনতা'-এই বিষয় নিয়ে এত আলোচনা, এত তথ্য সংগ্রাম, এত সেমিনার, এত পেপার রাইটিং, এত কাগুজে ব্যাপারে স্যাপারে খুব একটা কাজের জয়। আসল লড়াইটা অনেক কঠিন, অনেক বৃহৎ। নারীকে তার আপন ভাগ্য অধিকার করার ক্ষমতা নিজেকেই অর্জন করতে হবে। ঘরে-বাইরে গ্রামে-শহরে, দেশ-বিদেশ লৌহ বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আবিরাম যুদ্ধক্ষেত্রে কালযাপন করতে হবে। গ্যালারি থেকে যুদ্ধের ধারাবিবরনী পেশ করে যাওয়া অনেক সহজ ব্যাপার। কিন্তু মাঠের লড়াই? "কে না জানে সহজ কথা ঠিক সহজ নয়।"

উল্লেখপঞ্জী:

১। বসু, রাজশী এবং চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদনা); প্রসঙ্গঃ মানবীবিদ্যা; জুন, ২০০৮; উর্বী প্রকাশন; পৃ.-৩৯
২। বসু, রাজশী এবং চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদনা); প্রসঙ্গঃ মানবীবিদ্যা; জুন, ২০০৮; উর্বী প্রকাশন; পৃ.-৩৯
৩। বসু, রাজশী এবং চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদনা); প্রসঙ্গঃ মানবীবিদ্যা; জুন, ২০০৮; উর্বী প্রকাশন; পৃ.-৩৯
৪। মুখোপাধ্যায়; সোমা; অধিকার থেকে ক্ষমতায়ন; এপ্রিল ২০০৮; মিত্রম প্রকাশন; পৃষ্ঠা-
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়; কল্যাণী;ধর্মসংস্কার ও কুসংস্কার; অক্টোবর; ২০০ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা-১৩৭
৬। সেনগুপ্ত, মল্লিকা; স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ; জুলাই ২০০৮; আনন্দ প্রকাশন; পৃষ্ঠা- ১৩-১৪
৭। বন্দ্যোপাধ্যায়; কল্যাণী; ধর্মসংস্কার ও কুসংস্কার; অক্টোবর; ২০০ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা- ৪৩
৮। বন্দ্যোপাধ্যায়; কল্যাণী;ধর্মসংস্কার ও কুসংস্কার; অক্টোবর; ২০০ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা-৪৩
৯। বন্দ্যোপাধ্যায়; কল্যাণী;ধর্মসংস্কার ও কুসংস্কার; অক্টোবর; ২০০ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা-৪৩
১০। সেনগুপ্ত, মল্লিকা; স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ; জুলাই ২০০৮; আনন্দ প্রকাশন; পৃষ্ঠা-৫৬
১১। সেনগুপ্ত, মল্লিকা; স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ; জুলাই ২০০৮; আনন্দ প্রকাশন; পৃষ্ঠা-৫৬

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়; কল্যাণী; ধর্মসংস্কার ও কুসংস্কার; অক্টোবর; ২০০ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা-১২৫

গ্রন্থপঞ্জী

১। ঘোষ শাশ্বতী (২০০৭); সমতার দিকে আন্দোলনে নারীঃ প্রথম পর্ব, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা,৭০০০৭৩

২। দেবী, জ্যোতির্ময়ীঃ (১৯৯২): সমাজে একটি অন্ধকার দিক, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড, যাদবপুর নারী শিক্ষাকেন্দ্র যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ৭০০০৩২

৩। নাথ, রাখালচন্দ্র (১৯৮৮); উনিশ শতক; ভাবাসংঘাত ও সমন্বয়, কে পিঁ বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ৭০০০৭৩

৪। মুখোপাধ্যায়; সোমা; অধিকার থেকে ক্ষমতায়ন; এপ্রিল ২০০৮; মিত্রম প্রকাশন; কলকাতা, ৭০০০৭৩

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়; কল্যাণী; (১৯৯৮): ধর্ম ও নারী, এলাইড পাবলিশার্স, কলকাতা।

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়; কল্যাণী; ধর্মসংস্কার ও কুসংস্কার; অক্টোবর; ২০০ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭০০০৭৩

৭। বসু, রাজশী এবং চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদনা); প্রসঙ্গঃ মানবীবিদ্যা; জুন, ২০০৮; উর্বী প্রকাশন; কলকাতা, ৭০০০৭৩

৮। বসু, স্বপন: (২০০৩); সংবাদ- সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ দ্বিতীয় খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি, কলকাতা, ৭০০০৭৩

৯। বেভোয়ার, সিমন দ্য, ভাষান্তর, লতিকা গুহঃ (২০০১), স্ত্রীলিঙ্গ, দ্য সেকেণ্ড সেক্স; দীপায়ন, কলকাতা, ৭০০০৭৩

১০। ঐ (২০০৯)

১১। ভট্টাচার্য, সুতপা: (২০০০), মেয়েলি পাঠ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ৭০০০৭৩

১২। মৈত্র, শেফালী: (২০০৭) নৈতিকতা ও নারীদাস, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ৭০০০৭৩

১৩। সেনগুপ্ত, মল্লিকা; স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ; জুলাই ২০০৮; আনন্দ প্রকাশন; কলকাতা, ৭০০০৭৩